পূর্ব থেকে পশ্চিম

পর্বঃ ৩

আকাশের সমুদ্রে ভেসে চলছে কাতার এয়ারয়েজের চকচকে বিমান। কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে প্রবেশ করে ভারতের সীমানায়। এদিকে আমার অস্থিরতা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে যখনই গাড়ীতে চড়েছি, সারাটাক্ষণ তাকিয়ে দেখেছি মনোহর বাংলার রূপ। রূপসী বাংলা আমার, মন মাতানো দেশ, রূপ দেখে তার যেন আমার নয়ন ভরতো না। আমি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম রাস্তার ধারের বটগাছটাকে, দেখেছিলাম সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা, ধান খেত, পাট খেত, নদী, রাস্তার ধারের চা'য়ের দোকান, নড়বড়ে প্রাইমারী স্কুল, তরমুজের খেত, পুকুর, শালিক, কলসী কাঁখের কিশোরী, উড়ে যাওয়া বকের সারি। দেখেছিলাম বাজার-হাট-ঘাট, নৌকার সারি, মাঝি, রাখাল, কৃষক। দেখেছিলাম মেলা; নারিকেল, স্তুপ করে রাখা টমেটো, লাউ, ফুলকপি, শশা। আমি তাকিয়ে দেখেছিলাম বিভোর হ'য়ে, কখনো চোখ সরাতে পারিনি; চোখ নামাতে পারিনি ভোরের কাক, কার্তিকের কুয়াশার থেকে।

সেই বাংলার মাঠ-ঘাট-প্রান্তরের খোঁজে অবচেতন মনে তাকিয়ে আছি বিমানের জানালায় । কিছুই নেই, মেঘলা আকাশ ছাড়া; থাকবার কথাও নয়। আমি অস্থির থেকে অস্থিরতর হ'য়ে উঠি। এ-পথে শুধু নেই আর নেই। শিশুর কোমল গালের মত, কমলা রঙের রোদ নেই; পুকুর নেই, সকাল-দুপুর নেই; গ্রাম নেই, গ্রাম্য মেয়ে নেই; রোদেলা-দুপুরে-মধ্য-পুকুরে গ্রাম্য-মেয়ের-অবাধ-সাঁতার নেই। কোথায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছ? কোথায় পাকা জামের শাখা? কোথায় বাঁশবাগানের মাথার উপরটা? কোথায় কুসুমবাগের সকাল বেলার পাখি? কোথায় হাজার বছর ধ'রে হাঁটবার পথ? কোথায় অবসরের গান? কোথায় ডালিম গাছের তল?

একদিন মাটির কাছে থেকে কল্পনায় কত আকাশে উড়তে চেয়েছি, আকাশের রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি স্বপ্নের বেশে। তখন ভাবতেও পারিনি, কতটা কষ্ট মাটির কাছ থেকে দূরে থাকার, কতটা কষ্ট মাটির কাছ থেকে দূরে যাবার। আকাশে না-এলে কেউ জানতেও পারবেনা মাটির প্রতি কী তার মমতা, কী তার ভালোবাসা। হঠাৎ আমাদের অশুদ্ধ ইংলিশ বলা বিশুদ্ধ পাইলটের কণ্ঠ শুনে চেতনা ফিরে পেলাম। এ-কী? এ-যে দেখি পদ্মার চরের মধ্যে বিমান নামিয়ে দিচ্ছে। বিশাল শুন্য প্রান্তর খা খা করছে। মাটিতে নামতে চেয়েছি, তাই বলে এমন মাটিতে নামিয়ে ফেলবে নাকি? তার নির্মমভাবে বলা ইংলিশের মাঝ থেকে আবারো সফলতার সঙ্গে আমি একটা শব্দ উদ্ধার ক'রে ফেললাম, 'দোহা'। কাতারের রাজধানী। আমাদের বিমান দোহা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে যাচ্ছে।

নেমেই মনে হল, এ-কোথায় এলাম। বিমানবন্দরের নিরাপত্তাতো নেই বললেই চলে। প্রায় পঞ্চাশটা জায়গা সনাক্ত করা যাচ্ছে, যেখান থেকে খুব সহজেই রকেট লাঞ্চার মেরে বিমানগুলো উড়িয়ে দেয়া যায়। যাই হোক সে-সব নিয়ে যেহেতু আমার না ভাবলেও চলবে, তাই আমি উঠে গেলাম বিমান বন্দরে রাখা গাড়িতে। ইমিগ্রেশান পার হবার আগে কাতার এয়ারয়েজের চেক-ইন থেকে আমাকে হোটেলের টিকিট দিয়ে দেয়া হল। যাত্রা পথে আমার বাইশ ঘণ্টা বিরতি। আমার জন্য রিজার্ভ করা হয়েছে স্যুইস ঘরানার 'movenpick' হোটেল। বিশ্বজুড়ে এদের ৬৫টি হোটেল রয়েছে, আরো নতুন ৩২টি নির্মিতব্য। সংশ্লিষ্টদের দাবী অনুযায়ী এটি ফাইভ স্টার। হোটেলের টিকিট বুঝে নিতে গিয়ে কাউন্টারের খুব-সম্ভবত রূপসী মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি যদি বাইরে যেতে চাই, ঘোরার জন্য থাকতে চাই, তাহলে আমার কোন পারমিশান নেবার দরকার আছে কি না?' কি-ইংলিশ বলতে কি-যে বললাম, সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি এ-দেশে থেকে যেতে চাও নাকি?' আমার কহিতে ইচ্ছে করিল, ' ওহে বালিকা! এ তপ্ত মরুর বুকে থাকিয়া উটের ব্যবসা কিংবা মাছের কারবার করিবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।' তাকে বুঝিয়ে বললাম , 'শহরটা একটু ঘুরে দেখে নিতে চাই। তার জন্য কোন পাস নেবার দরকার আছে নাকি?' অবশেষে সে বুঝতে পেরে হেসে বলে, 'তোমার যেখানে খুশি চলে যাও, কেউ তোমাকে কিচ্ছু জিজ্ঞেসও করবে না।' উল্লেখ্য, ট্রানজিট রুট হিসেবে যারা লন্ডনে নেমে থাকেন, তাদেরকে লন্ডন শহরে ঢুকতে হলে এয়ারপোর্ট থেকে বিশেষ পাস নিতে হয়। যদিও সেটা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। যাই হোক, আমি আস্তে আস্তে ইমিগ্রেশানের দিকে যেতে থাকলাম। কাতারের ইমিগ্রেশান পার হওয়া খুবই সুখকর। কোন ধরণের অযথা ঝামেলা নেই। ভিতরে গিয়ে দেখি, আমার এবং সাথের অন্যসব যাত্রীদের জন্য বুকিং দেয়া হোটেলের কাউন্টারে গাড়ীর ড্রাইভাররা এসে অপেক্ষা করছিল। এ-সব ক্ষেত্রে এয়ারয়েজের সার্ভিস এবং ব্যবস্থাপনা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সাদা সাদা লম্বা আরবীয় আলখাল্লা জাতীয় জামা পরা এবং ঠোঁটে চুরুট টানতে থাকা কাতারীয়দের দেখে কেমন জানি হাসিই পেল আমার। মনে হল ডেকে বলি, 'পেয়েছোতো মাটির নীচের বিনা পয়সার তেল আর গ্যাস। তা-না হলে দেখতাম গায়ে বাতাস লাগিয়ে কত চুরুট টানতে পার।' উল্লেখ্য, জিডিপি'র হিসেবে বর্তমানে বিশ্বে কাতারের অবস্থান দ্বিতীয়। ধারণা করা হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে প্রথম অবস্থানে উঠে আসবে। ১৯৭১ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে সাধীনতা লাভকারী এ-দেশটির আয়তন বাংলাদেশের বারো ভাগের একভাগ। লোকসংখ্যা মাত্র ১৪ লক্ষ। বেশিরভাগ লোকজনই রাজধানী শহর 'দোহা'তে বসবাস করে। ঐতিহ্য বলতে আরব ঐতিহ্য, এরাবিয়ান কালচার, মরু ঝড় আর মরুভূমির জাহাজ উট। এদের সাহিত্যের কথা না বলাই ভালো, অবশ্য বলার জন্যতো কিছু থাকতে হয়। কাতার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। সরকার ব্যাবস্থা রাজতন্ত্র, শাসনব্যাবস্থা শরীয়াহভিত্তিক। সম্প্রতি নারীদের ভোটাধিকার দেবার মাধ্যমে আধুনিকতার পথে একধাপ এগিয়ে গেলেও অন্য আর সব উপসাগরীয় দেশের মত এখনও এখানে বিদ্যমান

আছে কুখ্যাত ‘স্পন্সরশীপ আইন’, যেটা দাসপ্রথার আধুনিক এক সংস্করণমাত্র। দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস রাজতন্ত্র হ’লে যা হবার কথা কাতারেরও তা-ই। বর্তমান আমীর তার পিতার কাছ থেকে এক রক্তপাতহীন ক্যু এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। পূর্ববর্তী আমীর অর্থ্যাৎ এখনকার আমীরের পিতা বর্তমানে নির্বাসিত আছেন। এবং সেটা অতি অবশ্যই সুইট্জারল্যান্ডে।

উপসাগরের তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা দোহা শহরে নতুন করে উঠতে থাকা চাকচিক্যময় বহুতলভবনগুলোই ব’লে দেয় এ-দেশের অর্থনীতির গোপন কথা। কয়েকবছর আগেও নাম করা হোটেল বলতে ছিল শেরাটন কিংবা সফিটাল এর মত হাতে গোনা দু-একটা। এখন পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে ফোর সীজনস্, মোভ-এন-পীক কিংবা হিলটনের মত নামী-দামী ফাইভস্টার হোটেলগুলো। এখনও নির্মাণকাজ চলছে অবিরাম। কিন্তু জিডিপির অবস্থানে যার অবস্থান দ্বিতীয়, নতুন নতুন তেল-গ্যাসক্ষেত্রের আবিষ্কারে প্রচন্ড রকমের জৌলুসময় আর যৌবনবতী হয়ে উঠেছে যে-রাষ্ট্র, পশ্চিমা বেণিয়ার দল সেখান থেকে লুটে-পুটে নেবেনা, সেটা হয় নাকি। নানান দেশে, তারা আসে নানান রূপে, নানান বেশে; সূঁই হয়ে ঢোকে, আর বের হয় না। কাতারের আমীরের কি সাধ্য তাদের রুখে দাঁড়ায়? আজ না হয় কাল। ভুলতো তাকে করতেই হবে। আলীবর্দী ভুল না করলে সিরাজ-উদ-দৌলা করবে, এটাই নিয়ম; কাউকে না কাউকে করতেই হবে। দু’দিন আগে আর পরে। ‘দোহা’তে শাখা স্থাপন করেছে Carnegie Mellon, Northwestern, Cornell, Calgary এর মত পশ্চিমের আরো সব নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এগুলো একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যবসাবিদ্যালয়। মনে পড়ে, ভারতবর্ষের এমনি করে উপকারের নাম করে একদিন সুরাট বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিল প্রথম ব্রিটিশ প্রতিনিধি। সেই যে শুরু, তারপর লুটে-পুটে নিয়ে শেষ।

ফাইভস্টার হোটেলের দুপুরের যথাসম্ভব অখাদ্য খাবার সেরে ঘুমোতে গেলাম বিশ্রাম নিতে। কিছুক্ষণ পরেই জেগে উঠতে হ’ল, হোটেলের রিসেপশান থেকে ফোন। ‘ইউ হ্যাভ সাম গেস্টস্ স্যার, ওয়েটিং ফর ইউ।’ কী আজব! বলে কি এ-রা। এই জায়গায় আমার গেস্টস্ আসবে কোথা থেকে? অত্র অঞ্চলে আসমান থেকে অনেক কিছু নাজিল হবার নজির আছে, তাই ব’লে অতিথিও নাজিল হয় নাকি? নীচে নেমে আমি আমার আসমানী অতিথিদের দেখতে গেলাম। এবার সত্যিই অবাক হবার পালা। আমারই দেশের পরিচিত লোকজন, এদের সাথে আমার সম্পর্ক আত্মার। তারা বাংলাদেশ থেকে ফোন করে জেনেছে আমার আসবার কথা, আর কাতার এয়ারওয়েজে ফোন করে জেনেছে আমার অবস্থান। এসেছে বেশ কয়েকজন একসাথে, শুক্রবার হবার কারণে তাদের সবার ছুটি। সবাই বুকে জড়িয়ে নিল। কয়েকজন আছেন আমার বাবার বয়সী। তাদের দেখে মনে হচ্ছে, অনেক দিন পর তারা হারানো কাউকে যেন ফিরে পেয়েছে।

এরা সাথে করে গাড়ী নিয়ে এসেছে, ‘দোহা’ শহর আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে ব’লে। আমার খুব সুবিধা হ’য়ে গেল। একেতো এরা সবকিছু চেনেন, তার উপর আমার হাতে যে-পরিমাণ সময় আছে, তাতে করে গাড়ি না

থাকলে দোহা ঘুরে দেখা সম্ভব হবে না। প্রথমেই চলে গেলাম বাংলাদেশিরা থাকে এমন এক জায়গার একটা হোটেলে। সিঙ্গারা, সমুচা, ছোলা, ভাত, মাছ, মুরগী দেখেতো আমার প্রায় আকাশের চাঁদ হাতে পাবার জোগাড়। দুপুরে হোটেলে না-পারতে কি না কি সব যা-তা খেলাম, বিমানের দেয়া খাবারও কোনোমতে গিলেছি শুধু। এদিকে টেলিভিশানেও দেখি চলছে বাংলাদেশী চ্যানেল। হোটেলে যারা খাচ্ছেন তারা সবাই বাংলাদেশের, রীতিমত ভীড়। আমাকে দেখে তাকিয়ে দেখছেন, আমিও খুব খুশি হয়ে তাকিয়ে থাকছি। এ-এক অন্যরকম আনন্দ। মনে হলো, শত-শত মাইল দূরে আমাদেরই লোকজন বসত করছে এই শহরে, তৈরী করে নিচ্ছে নিজেদের চারপাশ নিজেদের মত করে।

খাওয়ার মাঝখানে হঠাৎ একজন বলে বসল, ‘কম করে খান, রাতে ডিনার আছে।’ আমি অদ্ভূতভাবে তাদের দিকে চেয়ে থেকে জানতে পারলাম, তারা আমার আসা উপলক্ষ্য করে ডিনারের আয়োজন করেছেন। আমি বিব্রত হব, না আনন্দিত হব বুঝতে পারলাম না। খাবার শেষে আমার নিকট সম্পর্কের একজন নিয়ে গেলেন তার অফিসে। অফিসের ম্যানেজমেন্ট লেভেলের কেউ একজন আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন। এই ভদ্রলোকও বাংলাদেশের, বাড়ী খুলনার দিকে। এখানকার কোম্পানীতে খুব উঁচু পদে কর্মরত আছেন। আমি যাওয়ার পর দেখি, তিনি আগ থেকে অফিসে খাবার-দাবার এনে রেখেছেন। আমি দেখা করতে গিয়েছি দেখে ভদ্রলোক এত খুশি হলেন সেটা লিখে বুঝানো অসম্ভব। বেশ কিছুক্ষণ নানা ধরণের গল্প করলেন, দেশের বিভিন্ন জিনিস জানতে চাইলেন, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন। বিদায় নিয়ে একসময় চলে এলাম।

আসার পথে আবার একটা সেলুনের ভেতরে গেলাম। সবাই বাংলাদেশের। আমার অদ্ভূত রকমের ভালো লাগছিলো এদের সবাইকে থেকে। এ-যে ‘দোহা’ শহরে গড়ে উঠা এক-খন্ড মিনি বাংলাদেশ। সেলুনের মালিক ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমার জন্য এবং সাথের সবার জন্য নারিকেলের পানির ক্যান নিয়ে আসলেন। হঠাৎ আমাকে দেখে তারাও ভীষণ খুশি। এরপর আরেকজন বলেন তাঁর বাসা দেখে যাবার জন্য, আমিও সানন্দে রাজী। বাসায় গিয়ে দেখি, খুব যতনে প্যাকেট করা একটা কিছু আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন। খুব আগ্রহ করে, বেশ কিছু টাকা খরচ করে কিনে রেখেছেন, আমাকে উপহার দিতে। আমি বুঝতে পারলাম না আমার কি করা উচিৎ। শুধু হতবাক হয়ে রইলাম। এদের মাঝখানে একজন আবার আমার সাথে দেখা করতে এসেছে দুই ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে, বয়সে আমার থেকে ছোট, রাতেই তাকে আবার ফিরতে হবে গন্তব্যে। তবু সে খুশি, আমার সাথে দেখা হয়েছে ব’লে।

আমি শুধু ভাবলাম, জগতে কিছু কিছু জিনিস আছে যে-গুলোর কোন প্রতিদান হয়না, কোনো মূল্যমানেই সে-সবের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। মুহূর্তেই নিজেকে খুব দূর্বল মনে হলো। মনে হলো প্রতিদান ব্যাপারটা আসলে দেয়া সম্ভব না। কোনো কিছুরই প্রতিদান দেয়া সম্ভব না। আর সেটা যদি হয় ভালোবাসা, তাহলে তো প্রতিদানের প্রশ্নই উঠে না।

কেউ একজন বলে উঠেলেন, চলেন এবার ন্যাশনাল-এ যাবো। 'ন্যাশনাল'! শব্দটা শুনেই যেন প্রকম্পিত হলাম আমি। হঠাৎ যেন ব্যাপক একটা আলোড়ন উঠলো আমার ভেতর। ক্ষণিকেই বুঝতে পারি, সে আলোড়ন কিসের? ইতিহাস! পূর্ব-পুরুষের ইতিহাস!! ইতিহাসের হাতছানি। ইতিহাস যে কথা বলে। (...চলবে)

পরশপাথর
সেপ্টেম্বার ২৫, ২০০৯
Poroshpathor81@yahoo.com